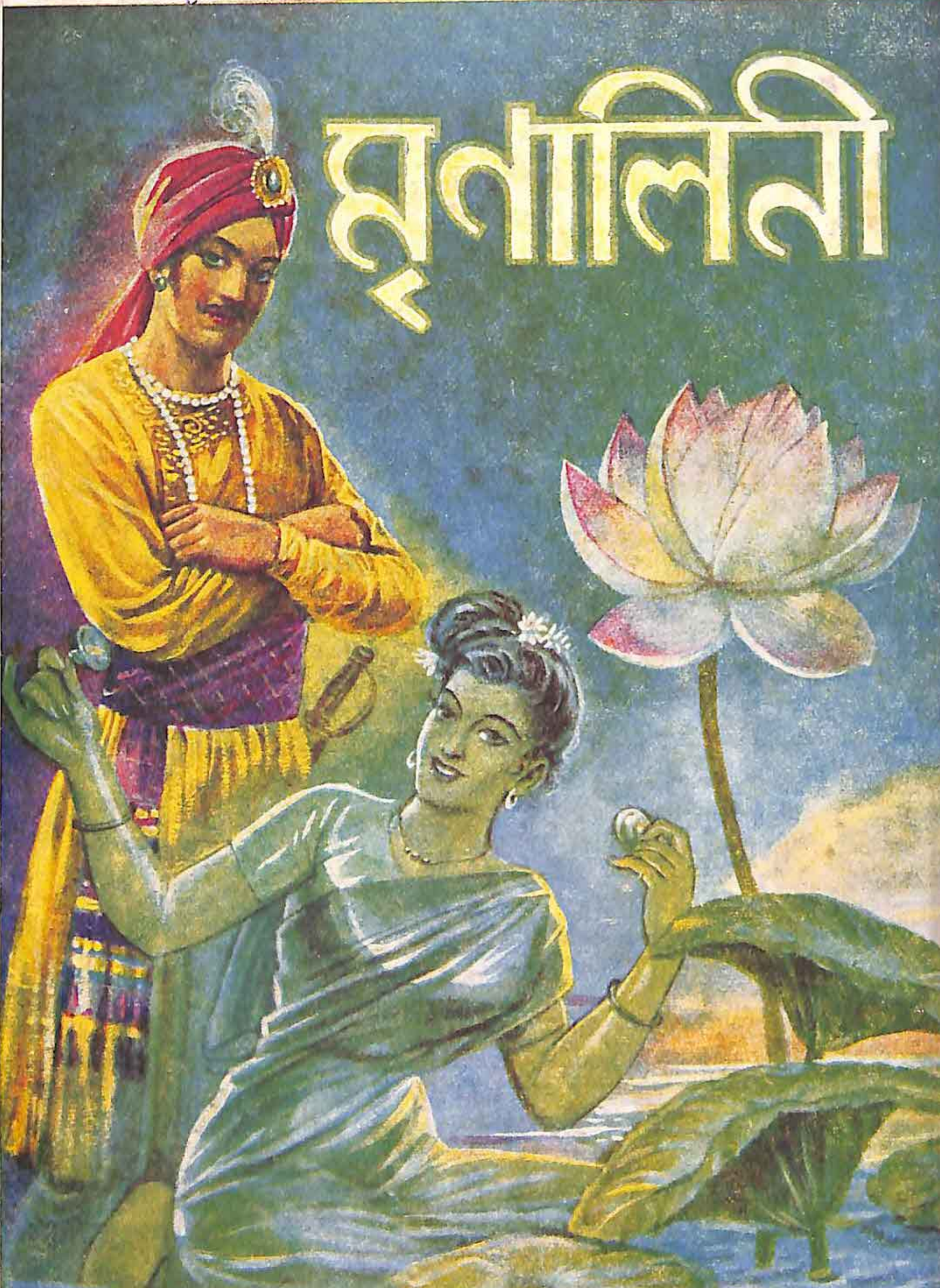

মৃণালিনী

44

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র দ্বাদশ গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

MRINALINI
CODE NO 4-64·029.

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

আগষ্ট
১৯৮৬
১৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

সম্পাদকের ভূমিকা

'মৃণালিনী' উপন্যাসখানি একদিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও আসলে ইহা একজন নারীর অন্তরের সুখ-দুঃখ কাহিনী লইয়া রচিত, কিন্তু ইহার পটভূমিকা-স্বরূপ রহিয়াছে বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা, বা সবচেয়ে কলঙ্কের কথা, সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর দ্বারা বঙ্গবিজয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায়, রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলের এক কাহিনীকে তিনি এই উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলার ইতিহাসের এই মহাকলঙ্ক কি করিয়া সংঘটিত হইল, কি করিয়া মাত্র সতেরো জন তুরস্ক অশ্বারোহী-সৈন্য আসিয়া সেই সময়কার গৌড়ের রাজধানী নবদ্বীপকে দখল করিয়া লইল, তাহারই এক চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে আঁকিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম এই উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে **pioneer**, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক সম্রাটের মতন অরূঢ়।

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটীর কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী স্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিকটা ভাঙ্গিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটি-কালেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁঠালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম

এন্ট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি. এ. পাশ ছাত্র। বি. এ. পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকুরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম. 'সংবাদ প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাথামাথি যে তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্যভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে

গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যের যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন····· বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্।"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃরূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব জন্মদাতা······সাহিত্যিক গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

———



গিরিজায়া গাহিতে লাগিলঃ
"কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী রে!"

মৃণালিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আচার্য্য

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব্ব প্রাবৃট্‌দিনান্ত-শোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম-গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণ-শরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন তুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্র ভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে তুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসঙ্গত সাহসে সেই তুর্দ্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ, পরম সুন্দর! ঘাটের উপরে সংসার-বিরাগী পুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ; শরীর শুষ্ক, আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত, ললাট ও বিরলকেশ-তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন;

এবার হেমচন্দ্র রুক্ষভাবে কহিলেন, "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে-আপনারই দয়া। মৃণালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি-প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে?"

হেম। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ-মন্ত্রণা কাহার? আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃণালিনী আমার আঙটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ নাই। আমার আঙটি আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙটির পরিবর্ত্তে অন্য রত্ন দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম; কিন্তু আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, এইজন্যই বিনা বিবাদে আঙটি দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিফল দিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে, কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে, কে তাড়াইবে? যবন-নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়াছিলে বলিয়া, তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ, যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃণালিনীপাশে বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? মাধবাচার্য্যের জীবন থাকিতে তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।"

হেম। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন, আমি এই পর্য্যন্ত।

মা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি? ভাল, তাহাই না হউক, দেবতারা আত্মকর্ম্মসাধন জন্য তোমার ন্যায় মানুষের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি

দেখিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত। আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পুরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিল; এইজন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু, পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে।"

হেম। তাহাকে যুদ্ধে স্বহস্তে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখ্‌তিয়ারকে না মারিয়া, সে হাতীকে মারিলে কেন?

হেম। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নইলে আমার মগধরাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "এ-সকল ঘটনা ত অনেক-দিন হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে?"

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বুঝিলাম, তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিয়াছিলে, তাহার কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ?"

না হও, তবে তুমি কি-প্রকারে শক্রশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি-প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?

হেম। রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিল? কেনই বা আমি দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ-পাষণ্ডকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া রহিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য-গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন-মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গর্ভাগ্নিগিরিশিখর-তুল্য তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, "হেমচন্দ্র! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। মৃণালিনী কোথায় তাহা বলিব—মৃণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হও, আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আর, যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?"

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকার্য্যের কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ত্রস্তহস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

মাধবাচার্য্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রীহত্যায় আমার তত নহে। এক্ষণে তোমাকে

পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিত আছে। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে স্থানান্তরে যাও, আশ্রম কলুষিত করিও না ; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না।” এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ব্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন, “দিগ্বিজয়! নৌকা ছাড়িয়া দাও।”

দিগ্বিজয় বলিল, “কোথায় যাইব ?”

হেমচন্দ্র বলিলেন, “যেখানে ইচ্ছা—যমালয়।”

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বুঝিত। অস্ফুটস্বরে কহিল, “সেটা অল্প পথ”, এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে কহিলেন, “দূর হউক। ফিরিয়া চল।”

দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচন্দ্র এক লম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন।

তাহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, “পুনর্ব্বার কেন আসিয়াছ ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন “আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে, আজ্ঞা করুন।”

মা। তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞা-পালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গোড়নগরে এক শিষ্যের বাটীতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যতদিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, ততদিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হেম। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে, অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া, যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ?

হেম। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ত্বরায় বখ্‌তিয়ার খিলিজী সেনা লইয়া গৌড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "এত দিনে বিধাতা বুঝি এ-দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন,—"কয় মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি। গণনায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হেম। কি-প্রকার?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস—বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হেম। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কত কালেই-বা তাহা হইবে? আর, কাহা কর্ত্তৃক?

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক্ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবে।

হেম। তবে আমার জয়লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি ত বণিক্ নহি।

মা। তুমিই বণিক্। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে?

হেম। আমি তখন বণিক্ বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে।

মা। সুতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্। গৌড়রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলে যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা করিবে। যে-পর্য্যন্ত সেখানে না

যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে-পর্য্যন্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব?"

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে।

হেম। থাকিতে পারে,—সে-বিষয়েও কতক সন্দেহ। কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে। গৌড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। যতক্ষণ তাঁহার বীরমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যাও, বৎস! প্রতি পদে বিজয়লাভ কর। যদি ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না! মৃণালিনী-পাখী আমি তোমারই জন্য পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছুদিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরে বিহঙ্গী

লক্ষ্মণাবতীনিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে দুইটি তরুণী কক্ষ-প্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন। উভয় রমণীই আত্ম-কর্ম্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন

পরস্পরের সাহত কথোপকথনের কোন বিঘ্ন হইতেছিল না। সেই কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, "কেন, মৃণালিনী, কথার উত্তর দিস না কেন? আমি সেই রাজপুত্রটির কথা শুনিতে ভালোবাসি।"

"সই মণিমালিনী! তোমার সুখের কথা বল, আমি আনন্দে শুনিব।"

মণিমালিনী কহিলেন, "আমার সুখের কথা শুনিতে-শুনিতে আমিই জ্বালাতন হইয়াছি, তোমাকে কি শুনাইব?"

মৃ। তুমি শোন কার কাছে, তোমার স্বামীর কাছে?

মণি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনিতে পাই না। এই পদ্মটি কেমন আঁকিলাম, দেখ দেখি?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক উর্দ্ধে আছে, কিন্তু সরোবরে সেরূপ থাকে না। পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রও সেইরূপ হইবে। আর কয়েকটা পদ্মপত্র আঁক, নইলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে?

মৃ। তোমার স্বামীর মত, পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) দুইজনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস আঁকিব না। আমি সুখের কথা শুনিয়া-শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

মৃ। তবে একটি খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব?

মৃ। খঞ্জন যদি এমনই দুষ্ট হয়, তবে মৃণালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পূরিয়াছ, খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও।

মণি। আমরা মৃণালিনীকে পিঞ্জরে পূরি নাই—সে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

মৃ। সে মাধবাচার্য্যের গুণ।

মণি। সখি! তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষে বলিবে। কিন্তু কৈ, আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে?

মৃ। মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকও এখানে আসি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর আমার দাসী আমাকে এই আঙটি দিল এবং বলিল যে, যিনি এই আঙটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙটি। তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষ থাকিলে তিনি এই আঙটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান ছিল, যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত।

মণিমালিনী কহিলেন, "ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি-প্রকারে পরপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে?"

মৃ। অসুখ কেন সখি—তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

মণি। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হন নাই। রাগ করিও না। তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি, এইজন্য বলিতেছি।

মৃণালিনী অধোবদনে রহিলেন। ক্ষণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "সখি, যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে, যাহা বলিব, তাহা এ-সংসারে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি।"

মণি। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে, তাহা ছুঁয়ে শপথ কর। মণিমালিনী তাই করিলেন।

মৃণালিনী তখন মণিমালিনীর কানে-কানে কি যেন বলিলেন।

শ্রবণে মণিমালিনী পরমপ্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর মাধবাচার্য্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে ? যে-বৃত্তান্ত বলিতেছিলে, বল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আঙটি দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে, দূতী কহিল, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি অনেকদিন রাজ-পুত্রকে দেখি নাই, বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচন-শূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে, এ-ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহেন।"

মণি। আর, অমনি তুমি চীৎকার করিলে ?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীৎকার আসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।

মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব ?

মণি। তারপর কি হইল ?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে 'মা' বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না, আমার নাম মাধবাচার্য্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু, এমত নহি, ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়। তুমি তাহার প্রধান বিঘ্ন।"

আমি বলিলাম, "আমি বিঘ্ন?" মাধবাচার্য্য কহিলেন, "তুমিই বিঘ্ন। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করা সুসাধ্য কর্ম্ম নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে। হেমচন্দ্রও অনন্যমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও এ-কাজ সিদ্ধ হইবে না। যতদিন তোমার সাক্ষাৎলাভ সুলভ থাকিবে, ততদিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত নাই—সুতরাং যবন মারে কে?" আমি কহিলাম, "বুঝিলাম, প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মারিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

মণি। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জ্বলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না।"

আমি মনে-মনে কহিলাম, তবে যাঁহার জন্য এ-জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে-জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাতত হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সে-ভাব দূর করা কি উচিত নহে?" আমি কহিলাম, "আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না।" মাধবাচার্য্য বলিলেন, "বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুল্য, কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর, তুমি সম্মত হও, বা, না-হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা

করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গৌড়দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে-সময় হেমচন্দ্র যে-অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।" এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এইখানে আসিয়াছি। ও কি, ও সই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ভিখারিণী

সখীদ্বয় এইসকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমল কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল :

"মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী
শ্যামবিলাসিনি রে!"

মৃণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে?"

মণিমালিনী কহিলেন, "বাহির-বাড়ীতে গাহিতেছে।"

মৃণালিনী আবেগের সহিত কহিলেন, "সই! সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন। সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল। গীত শেষ হইলে মৃণালিনী তাহাকে কহিলেন, "তোমার দিব্য গলা, তুমি গীতটি আবার গাও।"

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ

বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে-কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। তবে ভিখারিণী কুরূপা নহে। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার —ধূলি-কর্দ্দম পরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে। সে আজ্ঞামত পূর্ব্ববৎ গায়িতে লাগিল ঃ

কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাগিনী রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী রে।
দেশ-দেশ পর, সে শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী,
কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনে যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলি,
বনে বনে একা রে॥"

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি সুন্দর গাও। সই মণিমালিনী, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না।"

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন, ভিখারিণী! তোমার নাম কি?"

ভি। আমার নাম, গিরিজায়া।

মৃ। তোমার বাড়ী কোথায়?

গি। এই নগরেই থাকি।

মৃ। তুমি কি গীত গায়িয়া দিনপাত কর?

গি। আর কিছুই ত জানি না।

মৃ। তুমি গীত-সকল কোথায় পাও?

গি। যেখানে যা পাই, তাই শিখি।

মৃ। এ-গীতটা কোথায় শিখিলে?

গি। একটি বেণে আমায় শিখাইয়াছে।

মৃ। সে বেণে কোথায় থাকে ?

গি। এই নগরেই থাকে।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃ-সূর্য্যকরস্পর্শে যেন পদ্ম ফুটিল। কহিলেন—"বেণেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক কিসের বাণিজ্য করে ?"

গি। সবার যা ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।

মৃ। সে কিসের ব্যবসা ?

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ,—কোন্দল।

মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বটে। ইহার মহাজন কে ?

গি। যে মহাজন।

মৃ। তুমি ইহার কি ?

গি। নগদা মুটে।

মৃ। ভাল, তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ-সামগ্রী দেখে না, শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল :

... ...

"—নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হ'রে নিল।"

মৃণালিনী বাষ্পপীড়িত লোচনে, গদগদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, "এ কোন্ চোরের কথা ?"

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি, ব্যাপারীরও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারীর কি ?

গিরিজায়া গাহিল :

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি ॥"

মৃণালিনী সস্নেহে কোমলস্বরে কহিলেন, "মৃণাল কোথায় ? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে ?"

গি। পারিব, কোথায় বল।

মৃণালিনী বলিলেন :

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ, কোথা করিবে গমন।
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে ॥
হেনকালে কালমেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে ॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে ॥

কেমন গিরিজায়া, গীত শিখিতে পারিবে ?"

গিরি। তা পারিব।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী সখী, সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী

পিতৃ-প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। অতএব তিনি এ-সকল কথা সখীর নিকট গোপনে যত্নবতী হইয়া, গিরিজায়াকে কহিলেন, "আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও! তোমার বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব।"

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃণালিনী যে তাহাকে পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময়ে উহার কানে-কানে বলিলেন, "আজ রাত্রিতে এক প্রহরের পর গৃহের উত্তরদিকের প্রাচীরের মূলে আসিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দূতী

লক্ষ্মণাবতী নগরীর সর্ব্বধন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোক বৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাহ্ণে তাহার তলে উপবেশন করিয়া, হেমচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ পথ প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভৃত্য দিগ্বিজয় আসিল, হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন, "দিগ্বিজয়, ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি তাহার সন্ধানে যাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল এবং নগরীর রাজপথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায়া, দিগ্বিজয়ের সঙ্গে হেমচন্দ্রের নিকট আসিল।

চতুরা গিরিজায়া প্রথমে কথা ভাঙিতে চাহিল না। হেমচন্দ্রের আকুলতা দেখিয়া শেষকালে গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥

... ...

গানটি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র গদগদস্বরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মৃণালিনী। তুমি তাহাকে কোথায় দেখিলে ?"

গি। দেখিলাম সরোবরে, কাঁপিছে পবনভরে,
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

হে। এখন রূপক রাখ, আমার কথার উত্তর দাও—কোথায় মৃণালিনী ?

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন "তা ত আমি অনেকদিন জানি। এ নগরের কোন্ স্থানে ?"

গি। হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে-কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র তুই বিন্দু—তুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন! পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর ?"

গি। অনেক দূর।

হে। এখান হইতে কোন্ দিকে যাইতে হয় ?

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তারপর পূর্ব্ব, তারপর উত্তর, তারপর পশ্চিম—

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এখন তামাসা রাখ। আসল-কথা বল।"

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল, "মহাশয়। আপনি যদি মৃণালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন, "মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে।"

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র চিন্তিতান্তঃকরণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস। গাত্রোত্থান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ?"

হেম। আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?

মাধবাচার্য্য এ-কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ-পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া, পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর, তুমি যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ

উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। আমি আজি নবদ্বীপ যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্র-শস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হানি নাই—আমি আশা-ভরসা বিসর্জ্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু আপনি কি অন্তর্য্যামী ?" এই বলিয়া হেমচন্দ্র বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুব্ধ

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সম্মিলিত হইলেন। গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র মৃণালিনী কহিলেন, "কই হেমচন্দ্র কোথায় ?"

গিরিজায়া কহিল, "তিনি আইসেন নাই।"

"আইসেন নাই।"—এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল। ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপরে মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিলেন না ?"

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন।

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। মৃণালিনী কহিলেন, "কি প্রকারেই-বা পড়ি ? গৃহে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িলে, মণিমালিনী উঠিবে।"

গিরিজায়া কহিল, "অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল,

চকমকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনি আলো করিতেছি।”

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত করিল। অগ্ন্যুৎপাদন-শব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল। দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে, মৃণালিনী নিম্নলিখিতমত মনে-মনে পাঠ করিলেন।

“মৃণালিনী! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব? তুমি আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি—যদি তৎপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জন্য আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত এস্থানে সাক্ষাৎ করিব না! আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি যে তোমার জন্য সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোনক্রমে দিনযাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুত্রবধূ করিয়া আত্মসুখ সম্পূর্ণ করিব।”

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরিজায়া! আমার পাতা, লেখনী, কিছুই নাই যে, উত্তর লিখিব। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও। তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কারস্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি।”

গিরিজায়া কহিল, “উত্তর কাহার নিকট লইয়া যাইব? শুনিলাম, তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন।”

মৃ। নবদ্বীপ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম, তাঁহার গুরু আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য! মাধবাচার্য্যই আমার কাল!

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"

গিরিজায়া কহিল, "আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু-মৃদু গীতধ্বনি শুনিতে-শুনিতে মৃণালিনী গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল, "এইবার জালে পড়িয়াছ।"

মৃণালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড! হাত ছাড়।"

ব্যোমকেশ, হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র!

মৃণালিনীর ভর্ৎসনায় ব্যোমকেশ কহিল, "কেন হাত ছাড়িব?" এই বলিয়া সে মৃণালিনীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। মৃণালিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যোমকেশের পৃষ্ঠদেশে কে যেন তীক্ষ্ণ দংশন করিল।

ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল—"রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ, মৃণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিল যে, পৃষ্ঠ দিয়া দর-দরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্যায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেননা, তিনি ত

ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকোচিত কার্য্য তাঁহার করণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্ব্বাকৃতি বালিকামূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপসৃতা হইতেছে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন, কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুখে পুত্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া হৃষীকেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি হইয়াছে ? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতেছ ?"

ব্যোমকেশ কহিল, "মৃণালিনী লুকাইয়া বাহিরে গিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে।"

হৃষীকেশ, পুত্রের এই কুরীতি কিছুই জানিতেন না। মৃণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ-কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মৃণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে পশ্চাতে তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৃষীকেশ

মৃণালিনীর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া হৃষীকেশ কহিলেন —"মৃণালিনী! তোমার এ কি চরিত্র?"

মৃ। আমার কি চরিত্র?

হৃ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র, কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি! তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমার এ স্বভাব কেন?

মৃ। আমার স্বভাব খারাপ যে বলে, সে মিথ্যাবাদী।

ক্রোধে হৃষীকেশের অধর কম্পিত হইল! কহিলেন, "কি পাপীয়সী! আমার অন্নে উদর পূরাবি, আর আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। নাহয় মাধবাচার্য্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।"

মৃ। যে আজ্ঞা। কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃষীকেশের বোধ ছিল যে, যেকালে তাঁহার গৃহবহিষ্কৃতা হইলেই মৃণালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া, তাঁহার কোপ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন, "কালি প্রাতে! আজই দূর হও!"

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায় লইয়া আজই দূর হইতেছি।

হৃষীকেশ কহিলেন, "মণিমালিনীর নিকট কুলটার আলাপ কি?"

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল; কহিলেন, "তাহাই হইবে। আমি কিছুই লইয়া আসি নাই; কিছুই লইয়া যাইব না। একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রমাণ হই।"

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বসঙ্কেতস্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন ?"

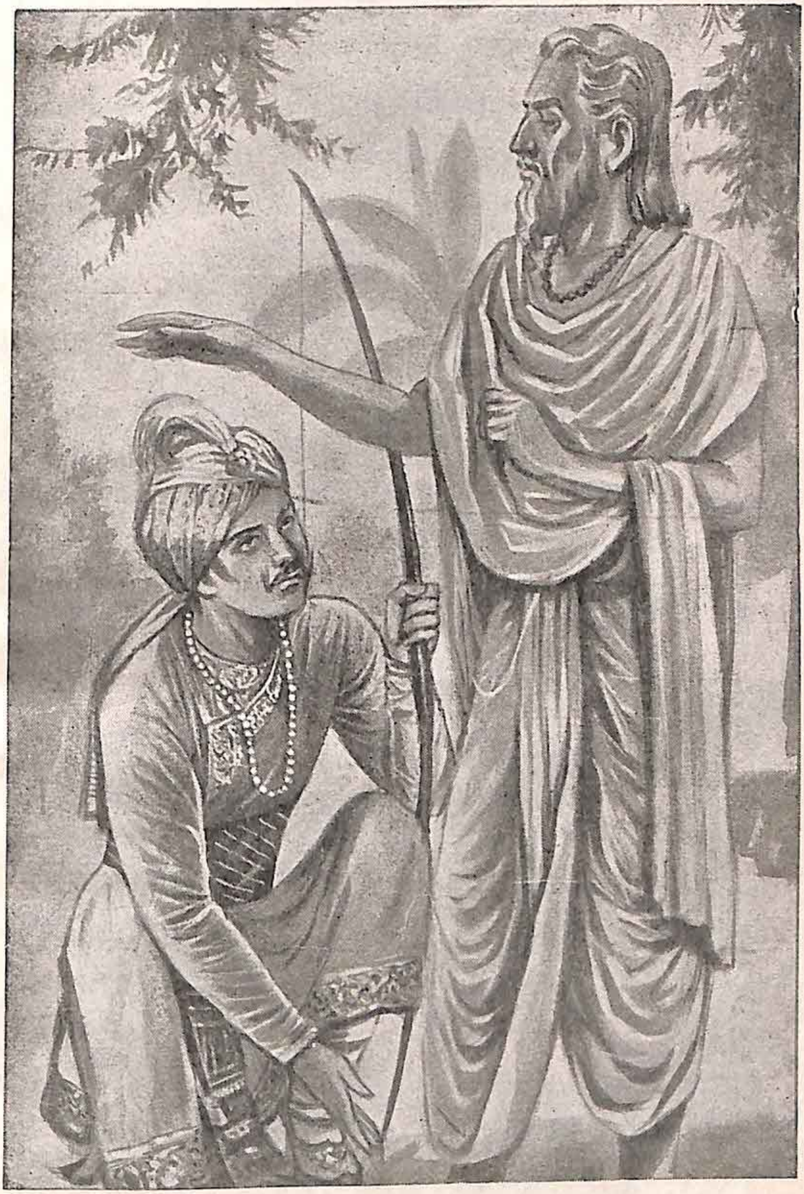
গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না-আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

তখন দুইজনেই বাহির হইলেন। পথ চলিতে-চলিতে গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাইবে ?"

মৃণালিনী বলিলেন, "নবদ্বীপ।"

গিরিজায়া সঙ্গ ছাড়িল না। তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল।

———



"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌড়েশ্বর

অতিবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন।

রাজসভায় নিয়মিত কার্য্য-সকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য অত্যুচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এই কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন। এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি-প্রকারে তাহাদের নিবারণ করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব? তুরকীয়েরা আসে আসুক।"

রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলে নীরব হইল। কেবল পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "সাধু। সাধু! আপনার যেরূপ যশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে?"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা—গোপনেই বক্তব্য। এসভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু যে অশ্ব, পদাতিক এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছুদিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।"

মা। কতক-কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ-প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। কিন্তু ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে ?

মা। যবন-বিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এই মাত্র কারণ।

প। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মা। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া, তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া, দস্যুর দণ্ড-বিধান করিবেন! গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া, উভয়ে শত্রুবিনাশের চেষ্টা করিলে, উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমনির্ম্মিতা

উপনগরপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শানুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দ্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অসমর্থ অথচ নিঃসহায়। শ্রবণ-শক্তি বিকল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছুদিন হইল, ইঁহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর একপার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া, তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া, বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।"

ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভৃত্যের দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কানে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুত অনেকেরই কথা কানে তুলেন না—কেননা, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমান-প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দ্দন আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হেম। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে ? তোমার নাম, রামকৃষ্ণ ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড়-প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল, ভাল ; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম, হনুমান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দূর হউক ; কার্য্য-সাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম, আমার আসায় আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই ; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না ? তোমার বাটীতে—কি ? আদ্যশ্রাদ্ধ ?

হে। ভাল, আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ-বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল ; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে, দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথায় ?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল-সীমা-

রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী। বালিকা, না, তরুণী? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাইত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?"

বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

হে। ইনি তোমার পিতামহ?

মনো। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?

হে। শুনিলাম, ইনি এ-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

মনো। এ-গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন?

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত; সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?"

ম। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজ হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ করিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু-মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কানে কম শোনেন।"

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৌকাযানে

নৌকা করিয়া গিরিজায়া আর মৃণালিনী নবদ্বীপের দিকে আগাইয়া চলিয়াছিলেন। মৃণালিনীর মুখ ভার দেখিয়া গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাহাকে দেখিতে ভালবাস, তাহাকে দেখিতে যাইতেছ, অথচ মুখ ভার কেন?"

মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না।

গি। কেন? তিনি কি সেখানে নাই?

মৃ। আছেন। কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। সে-ব্রত ভঙ্গ করাইব? আর কি বলিয়াই-বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী আবার কহিলেন, "আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হৃষীকেশ আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে?"

গি। তবে যাইতেছ কেন?

মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাতায়নে

হেমচন্দ্র কিছুদিন উপবন-গৃহে বাস করিলেন। জনার্দ্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতা-প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার সহিতও সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন-বা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বস্তুত, মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হেমচন্দ্র একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না।" আর-একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ? মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না।"

হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া মাধবাচার্য্য দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ-সময়ে গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্য সমবেত হইয়া গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু নিষ্কর্ম্মে দিনযাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে শয়নকক্ষে শয্যার উপর শায়িত হইয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কথা চিন্তা করিতেছিলেন। শয্যা হইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতিরোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়নে একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন! ভূমি হইতে বাতায়ন কিছু উচ্চ—এজন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন! মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে শ্মশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই

গৃহের চতুষ্পার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকেও দেখিলেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরকি আসিয়াছে।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপীকূলে

রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকির অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহার্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরকি দেখিয়া সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকির সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটি মাত্র তুরকি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকি সেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকি-সেনার পূর্ব্বচর। যদি তুরকি-সেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎ কার্য্য জন্য মৃণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া সে কর্ম্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পদ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক-প্রবাহ গ্রাম্যপথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত সুরম্য সোপানাবলিশোভিত এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকা-পাশে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, আম্র, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে, সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল, এমত নহে; বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায়-শাখায় সম্বন্ধ হইয়া বাপীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিংবদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনী বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত,

তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

কিন্তু হেমচন্দ্র এরূপ ভীরুস্বভাব নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতূহলশূন্য নহেন। বাপীর পার্শ্বে সর্ব্বত্র অনিমেষ লোচন নিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সেই দীর্ঘিকার সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া কে বসিয়া আছে। স্ত্রী মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? সে ত তুরকিকে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন।

হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সেই নারীমূর্তিও উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না। কহিলেন, "কে, মনোরমা! তুমি এখানে?"

মনোরমা কহিলেন, "আমি এখানে অনেকবার আসি--কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

হেম। আমার কর্ম্ম আছে।

মনো। এ রাত্রে কি কর্ম্ম?

হেম। পশ্চাৎ বলিব। তুমি এ রাত্রে এখানে কেন?

মনো। তোমার এ-বেশ কেন? হাতে শূল, কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথায়?

হেম। আমার ছিল।

মনো। এ-রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে।

হেম। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে না।

মনো। তা, এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ?

হেম। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা?

মনো। মানুষ-মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে যায় না। তুমি যুদ্ধে যাইতেছ।

হেম। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ?

মনো। তুরকিয় বেশ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি? তুমি তুরকি চিনিলে কি প্রকারে?"

মনো। আমি পূর্ব্বে তুরকি দেখিয়াছি।

হেম। সে কি? কোথায় দেখিলে?

মনো। যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরকির অনুসরণ করিবে?

হেম। করিব—সে কোন্ পথে গেল?

মনো। কেন?

হেম। তাহাকে বধ করিব।

মনো। মানুষ মেরে কি হবে?

হেম। তুরকি আমার পরম শত্রু।

মনো। তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তিলাভ করিবে?

হেম। আমি যত তুরকি দেখিতে পাইব, তত মারিব।

মনো। পারিবে?

হেম। পারিব।

মনোরমা বলিল, "তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।"

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যবন-যুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—মনোরমা কি মানুষী!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পশুপতি

গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি—অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর। রাজা বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যের ধর্মানুসারে পরমতাবলম্বী এবং রাজকার্য্যে অযত্নবান হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর। রাজসভাস্থলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথায়, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়-রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কারণবশতঃ এ-কাল পর্য্যন্ত পশুপতি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজ-প্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আম্রকানন। আম্রকাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে মৃদু মৃদু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে—মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া, বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুঝিলাম, আপনি তুরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র। সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র। আপনারই নাম মহম্মদ আলি? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যবন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিনভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ-ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে-কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই। আমরা তাহার সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিলেন, "খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত

আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ-রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন ?"

পশুপতি কহিলেন, "আমি এ-রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ-কর্ম্ম কেন করিব ?"

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার জন্য।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, "গৌড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা, পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম, ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি, তাহা করিব।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি গমনোদ্যোগী হইলেন। পশুপতি কহিলেন,—

"ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। আর কিছু শুনিয়া যান। আমি যবন-হস্তে এ-রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি—অক্ষমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেন-রাজা নামমাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন-রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব ?"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন ?"

প। খিলিজি কি দিবেন ?

ম। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে—আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলই থাকিবে। এই মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি ? এ সকলই ত আমার আছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব ?

ম। আমাদের আনুকূল্য না করিলে, কিছুই থাকিবে না ; যুদ্ধ করিলে আপনার ঐশ্বর্য্য, পদ, জীবন পর্য্যন্ত অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না। আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না, বিশেষ, মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত। গৌড়জয়-চেষ্টা আপাততঃ কিছুদিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন, না দেবেন, কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহী সেনা সজ্জিত হইবে, তখন গৌড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি ? পিঁপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া, পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন ? আমাদিগকে কি দিবেন ?

প। রাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল, আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার কথাবার্ত্তার আবশ্যক কি ? আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন কি ? আমাদিগকে কর দিবেন কেন ?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমতঃ, সেন-রাজ আমার প্রভু, বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি—তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা।

আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আমার আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে, সে-নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ, আমি স্বয়ং রাজা হইলে, এক্ষণে সেন-রাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিলে, যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয়-পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্ব্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না। বিশেষতঃ, সর্ব্বদা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে, নূতন রাজ্য সুশাসিত হয় না।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজা একেশ্বর হইবেন, অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্ত্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন, যেমন পূর্ব্বদেশে কুতুবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, তেমনি গৌড়ে আপনি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত আছেন কি না?

পশুপতি কহিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।"

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর-এক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে

না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে। আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও খরচ হইবে না। পাঁচজন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিবেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, 'কে তোমরা ?'

ম। আরও এক কথা, এদেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই উহার মুণ্ড যবনশিবিরে পাঠাইতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন—আমি শরণাগত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব ?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না! যবনসমাগম শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞে। আর-একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন ?

ম। আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া, অল্পমাত্র সেনা লইয়া দূত-পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকারমত কার্য্য না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর, যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আসেন ?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৌরোদ্ধরণিক

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য একজন গুপ্তদ্বার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্রবেশ করিব ?"

পশুপতি কহিলেন, "কর !"

একজন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে, পশুপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শান্তশীল! মঙ্গল সংবাদ ত ?"

চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আপনি একে-একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে-ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

পশু। যবন-সৈন্য কত দেখিলে ?

শান্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয় পঁচিশ হাজার হইবে।

পশু। তাহাদিগের কথাবার্ত্তা কি শুনিলে ?

শান্ত। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

পশু। কেন ?

শান্ত। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন, শান্তশীল তখন কহিলেন, "মহম্মদ আলি যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদাশঙ্কা করিতেছি।"

পশুপতি চমকিত হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

শান্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহার আগমন কেহ-কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, "কিসে জানিলে ?"

শান্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণদর্শনে আসিবার সময়

দেখিলাম যে, বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল। তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝিলাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না।”

পশু। তারপর ?

শান্ত। তারপর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি তাহাকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, “কাল প্রাতে উঠিয়া সে-ব্যক্তির প্রতিবিহিত করা যাইবে। এক্ষণে তোমাকে অন্য-এক কার্য্যসাধন করিতে হইবে। যবনসেনাপতির ইচ্ছা, অদ্য রাত্রিতে তিনি মগধরাজপুত্রের ছিন্নমস্তক দর্শন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে।”

শান্ত। কার্য্য নিতান্ত সহজ নয়। রাজপুত্র পিঁপড়ে মাছি নন।

পশু। আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না। কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে।

শান্ত। লোকে কি বলিবে ?

পশু। লোকে বলিবে, দস্যুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে।

শান্ত। যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম।

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা অষ্টভুজা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া যুক্তকরে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্বদর্শন—

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিমারূপিণী এক তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

তরুণী বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, "পশুপতি!"

পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা।

অষ্টম-নবম পরিচ্ছেদ

মোহিনী;—মোহিতা

সেই দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল, পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরে এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল, সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ? এ কি? আজি তোমার এ-ভাব কেন?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী সরলা বালিকা—সে মূর্ত্তিতে কেন আসিলে না? সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী, এ-মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজ তুমি এ-মূর্ত্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

প। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু, তুমি?

ম। পশুপতি, আবার? রাজকার্য্যে, না, নিজকার্য্যে?

প। নিজকার্য্যই বল। রাজকার্য্যেই হউক, আর নিজকার্য্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন,—"ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—নাহয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্ কথা না জান?"

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবা-বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব, কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি, সে-সকল আমার স্বপ্নমাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে-স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।"

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, আর কি আমায় ভালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে!—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিবে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব?

প। এ-কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ? আগে তুমি—পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ-রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি? নাহয় তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য গ্রহণে ফল কি?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক। আমি বিশ্বাসঘাতককে কি-প্রকারে ভক্তি করিব? কি-প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ, ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম নয়? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন; কোন উত্তর দিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিলেন, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই

প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি কাঁদিতেছ কেন?"

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আমি আর এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ফাঁদ

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্ত্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমার ধর্ম্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে, হেমচন্দ্রকে কহিলেন, 'সম্মুখে এই অট্টালিকা দেখিতেছ?"

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হেম। কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, "তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।"

হে। তুমি কোথায় যাইবে?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইয়া পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শান্তশীল এইসময় পশুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চোর অনুমানে কহিল, "কে তুমি? এখানে কি করিতেছ?" পরে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কার-শোভিত যোদ্ধৃবেশ দেখিয়া কহিল, "আপনি কে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না কেন?"

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন?

হে। আমি এখানে যবনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, "যবন কোথায়?"

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শা। আপনি কি-প্রকারে জানিলেন যে, এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে?

হে! তা, তোমার শুনিয়া কি হইবে?

শা। এই গৃহ আমার। যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্ট কামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনদ্বেষী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে, আমার সঙ্গে আসুন—উভয়ে চোরকে ধৃত করিব।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শান্তশীল সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং

এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ-রত্নাদি সকল আছে, আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন। আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুক্কায়িত আছে।"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহির হইতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল। হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিলেন। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন-সময়ে শুনিয়াছিলেন যে, ঐ-ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিলেন। হেমচন্দ্রকে কহিলেন, "হেমচন্দ্র, গৃহের বাহির হইয়া যাও।"

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ?"

ম। তাহা পরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে ?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তশীল কে ?

ম। চৌরোদ্ধরণিক।

হে। এই কি তাহার বাড়ী ?

ম। না।

হে। এ কাহার বাড়ী ?

ম। পরে বলিব।

হে। যবন কোথায় গেল ?

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির ! কত যবন আসিয়াছে ?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির ?

ম। মহাবনে। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচন্দ্র করলগ্নকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "ভাবিতেছ কেন ? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?"

হে। পঁচিশ হাজারের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে ?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে ?

হে। এখন ঘরে যাইব না।

ম। কোথায় যাইবে ?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে ?

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি-উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব।

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "পঁচিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্ব্বনাশ ! ছি ! ছি !"

হে। মনোরমা, তুমি এ-সকল সংবাদ কোথায় পাইলে ?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সৎকার

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন। তৎপরে প্রান্তর। প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন। দেখিলেন, স্কন্ধে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছে ; পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী আসিতেছে।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া, তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক-এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষা-কৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার একেবারে শরসংযোগ করিল এবং তাহা নিবারিত হইতে না-হইতেই পুনর্ব্বার শরত্রয় ত্যাগ করিল। এইরূপে অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নমণ্ডিত চর্ম্ম হস্তে লইলেন এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজাল নিবারণ করিতে লাগিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহীত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে পর পর দুইটি শর ত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

সংঘর্ষে হেমচন্দ্রের অশ্ব নিহত হইয়াছিল। তাঁহার স্কন্ধদেশে

একটা তীর তখনও লাগিয়াছিল। হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংস ভেদ করিয়াছিল —মোচনমাত্র অতিশয় শোণিত-স্রুতি হইতে লাগিল।

হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি ক্ষতস্থান হইতে প্রবলধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। অশ্ব হত হইয়াছে—নিজ বল হত হইতেছে; অতএব হেমচন্দ্র অপ্রসন্ন মনে ধীরে-ধীরে নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর অবশ হইয়া আসিল— শোণিতস্রাবে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইল। গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন অতি কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটীরের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম —রক্তস্রাবে বলহানি—এইসকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল। নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গাহিতেছে :—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।"

———

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"উনি তোমার কে ?"

যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী, তাহার কন্যা রত্নময়ী ও অপর দুইটি স্ত্রীলোক বাস করিত। সে দুইটি স্ত্রীলোক পাঠকমহাশয়ের নিকট পরিচিতা। মৃণালিনী আর গিরিজায়া, নবদ্বীপে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া, এইস্থানে আশ্রয় লাইয়াছিলেন।

একে-একে তিনটি স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইলেন। প্রথমে রত্নময়ী বাহিরে আসিয়া বৃক্ষতলে হেমচন্দ্রকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "সই! সই! দেখিয়া যাও! আমাদের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ!"

গিরিজায়া কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটীরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন!

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন।

গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি
মৃণাল অধমে।"

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

মৃণালিনী কহিলেন, "চুপ, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন।"

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে-ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

হেমচন্দ্র কিয়দ্দূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজায়া তাঁহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তখন রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?"

মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিজ্ঞা– পর্ব্বতো বহ্নিমান্

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন; শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। শূলে ভর করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন।

মৃণালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাকে দেখিলেন।

মনোরমা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেখিয়া মৃণালিনী মনে-মনে ভাবিলেন, "আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।"

গিরিজায়া ভাবিল, "রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "মনোরমা—এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না; হেমচন্দ্র দেখিলেন, আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মনোরমা, কি হইয়াছে?"

তখন মনোরমা ধীরে-ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন, এবং হেমচন্দ্রের বিমলিন মুখমণ্ডলের দিকে

চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোমার মুখ শুষ্ক; তুমি কি আহত হইয়াছ?"

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্কন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেলেন এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত করাইয়া, অঙ্গের রুধিরসকল ধৌত করিলেন এবং ভূমি হইতে নবদূর্ব্বাদল ছিন্ন করিয়া আপন দন্তে চর্ব্বিত করিলেন। পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া বস্ত্র দ্বারা বাঁধিলেন। তখন কহিলেন,—"হেমচন্দ্র! আর কি করিব? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিদ্রাভারে নিতান্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী, মনোরমার কার্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ কে, গিরিজায়া?"

গি। নাম শুনিলাম, মনোরমা।

মৃ। এ কি, হেমচন্দ্রের মনোরমা?

গি। তুমি কি বিবেচনা করিতেছ?

মৃ। আমি ভাবিতেছি মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। যে কার্য্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—মনোরমা সে-কার্য্য সম্পন্ন করিল—দেবতারা উহাকে আয়ুষ্মতী করুন। আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেতু—ধূমাৎ

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মৃণালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উপবন-গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। যেখানে-যেখানে বাতায়ন-পথ-মুক্ত দেখিল, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। এক-কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইল; দেখিল, তাঁহার শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই বাতায়ন-তলে উপবেশন করিল। পূর্ব্বরাত্রে যবন সেই বাতায়ন-পথে হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র-মনোরমার কি কথোপকথন হয়, তাহা বিরলে থাকিয়া শ্রবণ করে। কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল। কথা কহিতে পায় না, হাসিতে পায় না, বড়ই কষ্ট—স্ত্রীরসনা কণ্ডূয়িত হইয়া উঠিল, মনে-মনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়াই-বা কোথায়? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল—তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না।

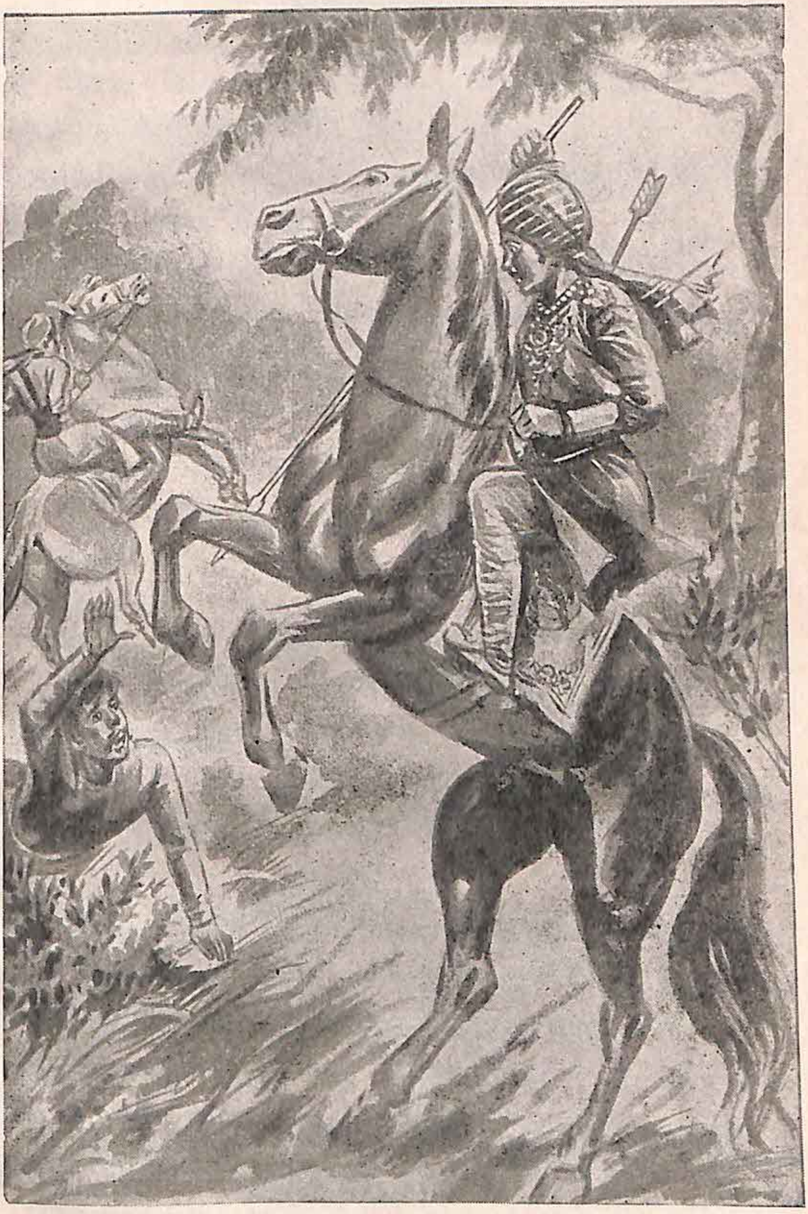
ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হেমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে?"

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল, কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল, এখন আমার



...তৃতীয়জন সে পলায়ন করিল, সে শান্তশীল...

কথার উত্তর দাও। কাল রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা ঘটিয়াছিল, সকল বল।"

মনোরমা মৃদু-মৃদু অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, গিরিজায়া তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল, চুপি-চুপি কথা হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোত্থান করিল।

তারপর কি ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে-ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিল, "ভিক্ষা দাও গো।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপনয়ন…বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্

গিরিজায়া গীত গায়িল :

"কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

গিরিজায়ার সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "এ কি! মনোরমা, এ যে গিরিজায়ার স্বর। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন।

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত-স্বরে কহিলেন, "গিরিজায়া! এ কি, গিরিজায়া! তুমি এখানে? তুমি এখানে কেন? তুমি এ-দেশে কবে আসিলে?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি এখানে অনেকদিন আসিয়াছি।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি এ-দেশে কেন এলে?"

গিরিজায়া কহিল, "ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি।"

হেমচন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিয়া আসিয়াছ?"

গিরিজায়া কহিল, "মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই।"

হে। কেন দেখিয়া আইস নাই?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

হে। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরায়? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন? কি প্রকারে গেলেন? কেন গেলেন?

গি। তাঁহার পিতা কি-প্রকারে সন্ধান পাইয়া, লোক পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাঁহার বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন।

হে। কি?···কি করিতে?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। গিরিজায়া মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মৃণালিনীর বিবাহের কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে! কৈ তা ত কিছুই হইল না! তখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিল, "হায়, কি করিলাম! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম? হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি—বলিয়া গেল, সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা কী হইবে?" হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন

"তোমার সংবাদ শুভ", তাহা গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে? যে ক্রোধভরে হেমচন্দ্র এই মৃণালিনীর জন্য গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে দুর্দ্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ।"

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না; "শিকলী কাটিয়াছে" সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আর একটি সংবাদ

সেইদিন মাধবাচার্য্যের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া কহিলেন, "এত শ্রম করিয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি এতদ্দেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সসৈন্যে সেন-রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাঁহারা অদ্যই এ-স্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজিকালি নগর আক্রমণ করিবে।"

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?"

হে। কিছুই না। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কাল এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ-বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন?

হে। সংবাদ-প্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম, এইমাত্র গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। বলহানি-প্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

"তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ যেরূপ হয়, তোমাকে জানাইব।" এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—"

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "গিয়াছিলাম। তুমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ? মৃণালিনী তথায় নেই।"

হে। কোথায় গিয়াছে?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে?

মা। বৎস! সে-সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইব, সে-আশঙ্কা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

মাধবাচার্য্য গৌড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তাহাই মাধবাচার্য্য এখন হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্য্যের কথা সমাপ্ত হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া বলিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"আমি ত উন্মাদিনী"

অপরাহ্ণে মাধবাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে, ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে কিন্তু পূর্ব্বজিত রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "এই কুলাঙ্গার রাজা, ধর্ম্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।"

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিলেন—"ভাই। আজ তুমি অমন কেন?"

হেম। কেমন আমি?

মনো। তোমার মুখখানা যেন শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটী করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন? আর দেখি—তাইতো, চোখে জল··· তুমি কেঁদেছ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। আবার চক্ষু অবনত করিলেন; পুনর্ব্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন; আবার

মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বুঝিলেন যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিলেন,—"হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?"

হেমচন্দ্র বলিলেন, "কিছু না।"

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিলেন না—পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমাকে বলিবে না কেন? আমি যে তোমার ভগিনী।"

হেম। আমার যে-যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে। আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।

মনোরমা কহিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেম। ভালবাসিতাম।

মনোরমা কহিলেন, "ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? কি? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?"

হেম। পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে?

মনোরমা। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা, প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তাকেও যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।"

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ-সকল তোমায় কে শিখাইল?"

মনোরমা মুখাবনত করিয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
গিরিজায়ার সংবাদ

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন প্রাণান্তে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচন্দ্র কেমন আছেন?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন? যেন দুঃখিত হইয়া বলিতেছ, কেন?

গি। সে কি?

মৃ। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল হয়েন নাই? তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এবার সহাস্যে কহিল, "তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও? আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?"

গি। শুনিলাম।

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কহিল। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমা যে নিশাপর্য্যটন করিয়াছিলেন ও কানে-কানে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিল।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ, তোমার মুখ শুক্‌নো। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না; আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছুদূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! ফের, আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা-যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল, কিন্তু মৃণালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মৃণালিনীর লিপি

মৃণালিনী কহিলেন, গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে',…ইহা শুনিয়া তিনি কেনই-বা রাগ না করিবেন ?"

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তখন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই।

এর বিহিত করা উচিত; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে।"

গিরিজায়া স্বীকৃত হইয়া সত্বরে আহারাদির জন্য গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন ঃ

"গিরিজায়া মিথ্যাবাদিনী। যে কারণে সে তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। আমি মথুরায় যাই নাই। যে-রাত্রিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি। নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ-পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি ?"

গিরিজায়া এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে গিরিজায়া তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আবার কেন ?"

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি।

হে। পত্র কাহার ?

গি। মৃণালিনীর পত্র।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, "এ পত্র কি-প্রকারে তোমার নিকট আসিল ?"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার ?

গি। হ্যাঁ, তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানা না পড়িয়া তাহা খণ্ড-খণ্ড করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখণ্ড-সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছি। তুমি যে-দুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ, সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, "দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে-ধীরে বলিল, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব-দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক্, তুমি আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব্ব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগত হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নয় বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গিয়া, পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় বসিয়া মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল।

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিল, তাহার সম্মুখে মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দেখিল, মৃণালিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী বলিলেন, "গিরিজায়া, আর-একবার তোমাকে যাইতে হইবে।"

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ-সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্য না-করিয়াছ কি? তুমি কখন আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকট এ-সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি-প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ-প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।

গি। প্রাণ বিসর্জ্জন! সে কি মৃণালিনী?

মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অমৃতে গরল—গরলামৃত

হেমচন্দ্র আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মৃণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। মৃণালিনীর জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। আর এখন? এখন হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—'মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।' কিন্তু তাই বলিয়া কি এখন তাঁহার স্নেহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে!

হেমচন্দ্র সেই রাত্রিতে শয্যোপরি শয়ন করিয়া বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয় মাত্র। যাহার হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না। এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্প-মোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্‌কালে, একদিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে

পারেন, আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্য রোদন করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "আমি মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শঙ্কা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ ? মৃণালিনী কোথায় ? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন ; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন ? আমি তাহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন ? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন ?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি আসুন।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে,—যথায় মৃণালিনী সোপানোপরি বসিয়া-

ছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচন্দ্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুরাণি! উঠ। রাজপুত্র আসিয়াছেন।"

মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রুজলে চক্ষু পূরিয়া গেল। অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে যেমন শাখাবিলম্বিনী-লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদতলে পতিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

এত দিনের পর!

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এতকাল পরে দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। যেদিন প্রদোষকালে যমুনার উপকূলে বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল।

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী! কেমন আছ?"

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন। কিন্তু আবার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠরুদ্ধ হইল। কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ?"

মৃণালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, "মৃণালিনী! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস

করিবার কতক কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে। যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।"

মৃণালিনী কহিলেন, "কি ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিলে কেন ?"

ঐ নাম শুনিবামাত্র কুপিতা ফণীর ন্যায় মৃণালিনী মাথা তুলিলেন! কহিলেন, "হৃষীকেশ আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অল্প সন্দিহান হইলেন, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল ?"

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব ? হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।"

শ্রুতমাত্র তীরের ন্যায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল।

"পাপীয়সী—নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি!" এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকে দেখিলেন, গিরিজায়া তাঁহার সজল জলদ ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃত করিলেন। বলিলেন, "তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্যমাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল। "অশ্বত্থামা হতঃ" এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। প্রশ্নান্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না। হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ।

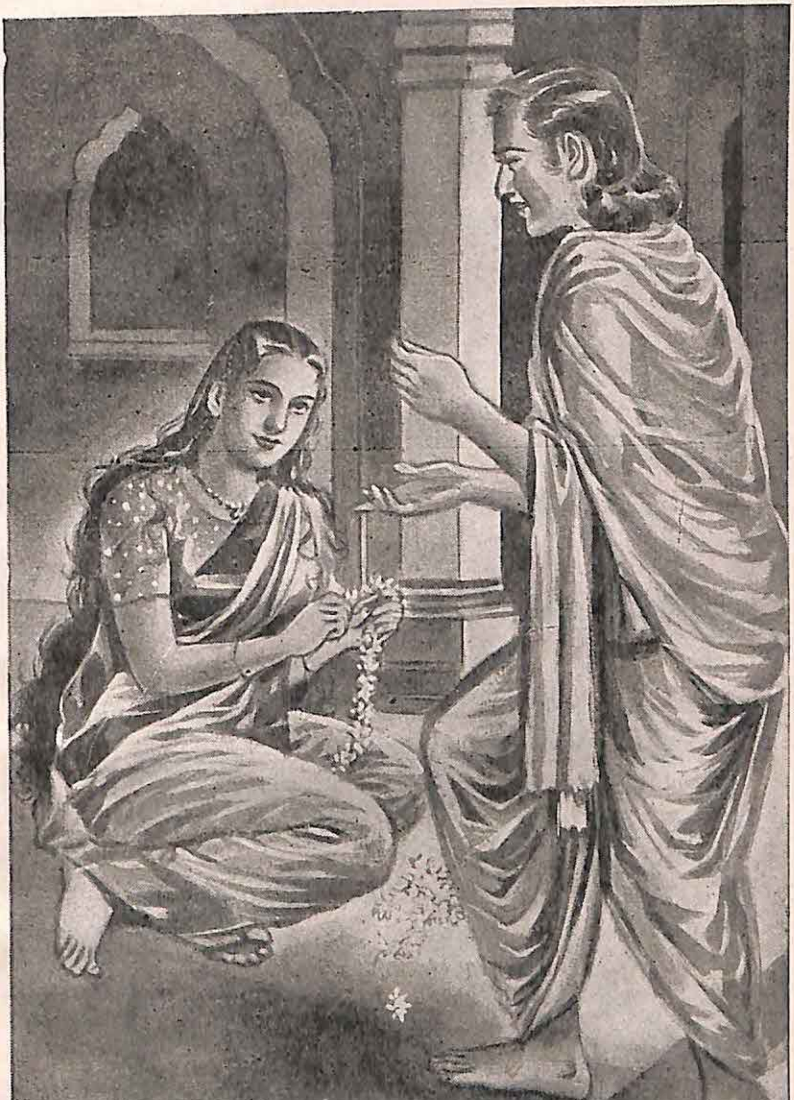
শীতল-সমীরণময়ী উষার পিঙ্গল মূর্ত্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরাণি, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত ?"

গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না।

———



পশুপতি বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কও!" মনোরমা মুখ তুলিয়া দেখিলেন।

চতুর্থ-খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

উর্ণনাভ

যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে উর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল।

নিশীথসময়ে নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি নিজ দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ শান্তশীলকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল! প্রাতে যে সংবাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন কার্য্যের ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্য কার্য্যের পরিচয় গ্রহণ করুন।"

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয়জন যবন দূত-স্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্ম্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না ?

শা। তিনি বড় চতুরের ন্যায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

প। সে কি প্রকার ?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বসাইয়াছিলেন। তাহা

লইয়া অন্য প্রান্তে রাজাকে শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ-গৌড়বিজেতার রূপ-বর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেনকে ডাকাইয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজ-প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ ?"

সে কহিল, "আসিয়াছি !" মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, "সে দেখিতে কি প্রকার, বিবৃত কর।"

তখন মদনসেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজির যথার্থ রূপ বিবৃত করিলেন। কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল। সুতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন।

প। তাহার পর ?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন—"আমি এ বৃদ্ধবয়সে কি করিব! সপরিবারে যবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইব দেখিতেছি।" দামোদর তখন শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ! ইহার সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে-থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।" রাজা এ-পরামর্শে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্তপক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, যবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য্য সিদ্ধি হইলে তোমাদিগকে সাধ্য-মত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিব না, এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে। শান্তশীল বিদায় হইল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিনা সূতার হার

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহু ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী, কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ যাহাতে আলো হয়—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, এ-সকল তাঁহার গৃহে ছিল না। অদ্য শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, "এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।"

এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে পশুপতি শয়নের পূর্ব্বে, অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় মনোরমা বসিয়া আছেন।

পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, কখন আসিলে ?"

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া, বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতে-ছিলেন। কথায় কোন উত্তর দিলেন না। পশুপতি কহিলেন, 'আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।"

মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমি এ-বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্ম করি নাই। কিন্তু যে-পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই-চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব।"

মনোরমা কোন উত্তর করিলেন না। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি সেই বিনাসূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিলেন।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নিঃশব্দে তাহা দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধি-প্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন দেখিয়া কহিলেন, "মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি শয়নে যাই।"

মনোরমা অম্লান বদনে কহিলেন, "যাও!"

পশুপতি বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের কন্যা কোথায়, জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।"

ম। আমি জানি, কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব?

পশুপতি অবাক্ হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায়, অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই

মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্‌কালে না পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশবের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে পূর্ব্বেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব, হৈমবতীকে আচার্য্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে কেশব, আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন—'এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী। অথবা পশুপতিকে কখনও জানাইবেন না যে, ইনি তাঁহার স্ত্রী।' সেইপর্য্যন্ত তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া প্রতিপালন করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

প। এখন সে-কন্যা কোথায় ?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে। জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহার আচার্য্য।

প। মনোরমা—রাক্ষসি! এতদিন কেন আমাকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলে ?

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে ?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি ? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দ্দন শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম।

ম। জনার্দ্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন ? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন ?

ম। আমার কাছে প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মণীর নিকটে বলিতেছিলেন, আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম।

প। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে! এক্ষণে যদি আমি রত্ন

পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিলেন, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি! এ-ঘর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এ-দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নইলে—"

প। নহিলে কি?

ম। নহিলে দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায়-আমায় এই সাক্ষাৎ, এজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

প। আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। আমি যে-পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে-পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু আর ফিরিবার উপায় নাই। তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।

বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন ও অল্পকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।" মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইলেন।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যবনদূত-যমদূত বা

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিত-জাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদিগের যোদ্ধবেশ, সর্ব্বাঙ্গ প্রহরণজালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। আর, যে-সকল সিন্ধুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদেশ অশ্বারোহী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতূহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহারা যবন রাজার দূত।" এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞা-ক্রমে সেই পরিচয়ে নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশলাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ-রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্প সংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কিজন্য আসিয়াছ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন-রাজপ্রতিনিধির দূত; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না!"

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বাগ্রে একজন খর্ব্বাকায় দীর্ঘবাহু কুরূপ যবন। দুর্ভাগ্য-

বশতঃ দৌবারিক তাহার গতিরোধ জন্য শূলহস্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন দৌবারিককে নিজ করস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন-আপন-কার্য্য কর।"

অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্যে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল—এবং অশনি-সম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌ-বারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, "যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধ-বনিতা পৌরজন যেখানে যাহাকে দেখিল, তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্ন-মস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই ঘোর আর্ত্তনাদ—অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিল। তাঁহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে?"

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুষ্ক শরীর জলস্রোতঃপ্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজনপাত্রের উপর পড়িয়া যান দেখিয়া

মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন, "চিন্তা নাই, আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মহিষী কহিলেন, "চিন্তা কি? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন আমরা খিড়কী-দ্বার দিয়া সোনারগাঁ যাত্রা করি।"

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কী-দ্বারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজকুল-কলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

যোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে!

যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাল ছিঁড়িল

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখতিয়ার খিলজি ধর্ম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত!

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। বখতিয়ার খিলজি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখতিয়ার খিলজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিতবর! রাজসিংহাসনে আরোহণের পথ কুসুমাবৃত নহে। এ-পথে চলিতে গেলে বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্ব্বদা পদে বিদ্ধ হয়।"

পশুপতি কহিলেন, "সত্য। কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যক। ইহারা নির্ব্বিরোধী।"

বখতিয়ার কহিলেন, "আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন ?"

প। যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই।

ব। কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবল মাত্র আমাদিগের এক যাচ্ঞা আছে।

প। আজ্ঞা করুন।

ব। কুতুব উদ্দীন গৌড়শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

প। সন্ধির সময়ে এইরূপ কোন কথা হয় নাই।

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর একথা না হইলেও আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেননা, এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেরা বাংলা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবন-সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্যও সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, ইহারা বলক্রমে করিবে। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।"

বখতিয়ার তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখতিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড় জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ-ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইভ সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখতিয়ার কহিলেন, "ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের শুভদিন। এরূপ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।"

পশুপতি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! বলিলেন, "একবার মাত্র অবকাশ দিন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।"

ব। আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল, পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সে কি? আমি কি বন্দী হইলাম?"

বখতিয়ার কহিলেন, "আপাতত তাহাই বটে!"

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিরুদ্ধ হইলেন। উর্ণনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল।

সেইদিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া, নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেইদিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত ত স্বাভাবিক নিয়ম!

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর ভাঙ্গিল

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি যবনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ করিলেন। পালঙ্ক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া গবাক্ষ নিকটে উদ্যানস্থ একটি আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িলেন এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দ্দনের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার নিষ্পীড়নে, বাত্যাসন্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ ভূরি-ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি-ভূরি পদাতিদলে, ভূরি-ভূরি খড়্গী, ধানুকী, শূলিসমূহসমারোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বার রুদ্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ
যবন বিপ্লব

যবনেরা রাজপথে যে দুই-একজন হতভাগ্য আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বারভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল; কোথাও-বা দ্বার ভগ্ন করিয়া, কোথাও-বা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোথাও-বা শঠতা-পূর্ব্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহ প্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্ব্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্ব্বক করিতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অশ্বের পদ-ধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্ত্তনাদ, মাতার রোদন, শিশুর রোদন, বৃদ্ধের করুণা-কাঙ্ক্ষা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।

যে-বীরপুরুষকে মাধবাচার্য্য এত যত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ-সময়ে তিনি কোথায়?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন। একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন?

হেমচন্দ্র এখন আপন শয়ন-মন্দিরে শয্যোপরি শয়ন করিয়া ছিলেন। নগরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ?"

দিগ্বিজয় কহিল, "যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বখতিয়ার কর্ত্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনেন নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নাগরিকেরা কি করিতেছে?"

দি যে পারিতেছে, পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে, সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আর, গৌড়ীয়-সেনা ?

দি। কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে ? রাজা পলাতক। সুতরাং তাহারা আপন-আপন পথ দেখিতেছে।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবেন ?"

হে। নগরে।

দি। একাকী ?

হেমচন্দ্র ভ্রূকুটী করিলেন, ভ্রূকুটী দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং ভীষণ শূলহস্তে নির্ঝরিণী-প্রেরিত জলবিম্ববৎ সেই অসীম যবনসেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হয় নাই, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল না। যাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে-কোন যবন তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্যম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল। হেমচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, "একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন। এমন সময় পথপার্শ্বে এক কুটীরমধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, গৃহমধ্যে যবন নাই। এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে

পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সে এ-প্রকার গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু আসন্ন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবন-ভ্রমে কহিতে লাগিল,—"আইস, প্রহার কর, শীঘ্র মরিব, মার—আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও—আঃ—প্রাণ যায়—জল! জল! কে জল দিবে!"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার ঘরে জল আছে?"

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না, মনে হয় না—জল! জল! পিশাচী! সেই পিশাচীর জন্য প্রাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে। পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জলদান করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "না! জল খাইব না! যবনের জল খাইব না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না।"

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, "তোমার আর কি উপকার করিব?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে? সেই রাক্ষসীকে বলিও—বলিও—আমার অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে? কে পিশাচী? পিশাচী চেন না? পিশাচী—মৃণালিনী। মৃণালিনী—পিশাচী।"

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয়?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কে হয়? কেহ না—আমার যম।"

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমার কি করিয়াছে?

ব্রাহ্মণ। কি করিয়াছে? কিছু না। আমি—আমি তার দুর্দ্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হে। কি দুর্দ্দশা করিয়াছ ?

ব্রা আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার তাহাকে জল পান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া স্থির হইলে, হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

ব্রা। ব্যোমকেশ।

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। দন্তে অধর দংশন করিলেন, আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিবাস কোথায় ?"

ব্রা। গৌড়—মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

হে। তার পর ?

ব্রা। তারপর—তারপর আর কি ? তারপর আমার এই দশা। মৃণালিনী পাপিষ্ঠা ; বড় নির্দ্দয়—আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইলাম। পিতা তাহাকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিলেন। রাক্ষসী —রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

ব্রা। কেন গালি দিই ? মৃণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না। সে চলিয়া আসিল, তাহার জন্য কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—কোথায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি ? গিরিজায়া, ভিখারীর মেয়ে—তার আয়ি, বলিল,—নবদ্বীপে আসিয়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম, সন্ধান নাই। যবন-হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্য মরিলাম, দেখা হইলে বলিও—আমার পাপের ফল ফলিল। আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিবিল। ক্ষণপরে ব্যোমকেশ প্রাণত্যাগ করিল।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। আর যবনবধ করিলেন না— কোনমতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ
মৃণালিনীর সুখ কি ?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপান-প্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃণালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না--সর্বত্রই সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাত হইল, পূর্ব্বাচলের সূর্য্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। তখনও মৃণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চল হইল, বলিল, "রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন ?"

মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও তাঁহার দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—বলিল, "কি ঠাকুরাণী! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী!"

মৃ। তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী ; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।

গি। পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন ?

মৃ। সে আমারই দোষ ; কি বলিতে কি বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণী! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেদনা।"

গি। হেমচন্দ্র তোমায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাথরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না ; বোধ হয় আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিস্মিত হইল! বলিল, "ঠাকুরাণী। এ সংসারে আপনি সুখী।"

মৃ। কেন?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।

গি। তবে কি সে?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

নবম ও দশম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন

গিরিজায়া কহিল, "গৃহে চল।"

মৃণালিনী কহিলেন, "নগরে এ কিসের গোলযোগ?"

তখন যবন সেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজায়া বলিল, "চল, এইবেলা সতর্ক হইয়া যাই।" কিন্তু দুইজন রাজপথের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন।

মৃণালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরিজায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।"

গি। সে কি?

মৃ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। যদি নিঃসহায় প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি, কি বিপদে পড়িবেন।

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না।

তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।

মৃণালিনীরও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্ব্ব সমরে বিজয়ী হইয়াছেন। মৃণালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত হস্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মৃণালিনীকে যেন সেই সেনা তরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—তখন হেমচন্দ্র স্বয়ং অবতরণ করিয়া তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখনও ত্যাগ করিব না।" সেই কণ্ঠস্বরে যেন—

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না," জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন? দেখিলেন—হেমচন্দ্র সম্মুখে! তিনি বলিতেছেন—"আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবন বাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন; সে হাসির অর্থ "আমি এখন কত সুখী!"

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচয়

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া

দুঃখের সময় দুঃখের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুর বধূতে প্রভেদ থাকেনা; আজ সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা এতদিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্য?"

মৃ। রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্য প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্য প্রকাশ করিতেছি।

গি। ঠাকুরাণী। সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।

তখন মৃণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল।

আমি একদিন মথুরায় রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমুনার জল-বিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল। রাজকন্যা প্রভৃতি অনেকেই নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন। আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান। হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া

আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না। এরূপ দুর্দ্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। সুতরাং তিন দিন আমাকে সেখানে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম, কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিতেন তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'বিবাহ কর।' সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবসে, দুর্য্যোগের উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম। দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্য্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।"

গি। কন্যা সম্প্রদান করিল কে?

মৃ। অরুন্ধতী নামে আমার এক মাসী ছিলেন। আমাকে বালককাল হইতে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত আর মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না?

মৃ। না, তিনি জানিলে সর্ব্বনাশ হইত। মগধরাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বিস্মিত হইয়া মৃণালিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভৃত্যের প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি এ ভারত-ভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব—বিধিলিপি। নচেৎ বিনা-বিবাদে যবনেরা গৌড়জয় করিল কি-প্রকারে? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে একদিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এইক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম—কিন্তু যুদ্ধ ত' দেখিলাম না! কেবল দেখিলাম যে, এক-পক্ষ আক্রমণ করিতেছে—অপর-পক্ষ পলাইতেছে।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈব-নির্দ্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন, তাঁহারা ত এখনও বিজিত হন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহার অল্পই সম্ভাবনা।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "জ্যোতিষগণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে। পূর্ব্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন-জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়-রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব্ব নহে—কামরূপই পূর্ব্ব। তথায়ই আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা সুস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সদুপায় হইল ?

মা। এই যবনেরা এ-পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া, অজেয় বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবারমাত্র পরাজিত হইলে তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে, যবনেরা কতদিন তিষ্ঠিবে !

হে। আপনি আশামাত্রের আশ্রয় লইতেছেন ; আমিও তাহাই করিলাম ; এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। এ-নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য। কেন না, যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা—তুমি অদ্যই এ-নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব ?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া মৃদু-মৃদু কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি আমার কথায় মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে !"

হেমচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় মৃদুভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অত্যাজ্য। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ করিয়া কহিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানিলাম না ?"

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, "যে স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা। মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা কাল প্রকাশ করিয়াছি।"

হেমচন্দ্র তখন ব্যোমকেশের বৃত্তান্তসকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন; কহিলেন—"বৎস! বড় প্রীত হইলাম! তোমার প্রিয়তমা এবং গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—আমি অগ্রে কামরূপ যাইতেছি। সময় বুঝিলে, কামরূপাধিপতি তোমার নিকটে দূত প্রেরণ করিবেন।"

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত

যে-রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতেছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনাবিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন, "যবন! প্রিয়সম্ভাষণে আর আবশ্যক নাই। একবার তোমারই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধর্ম্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদের কোন প্রিয়সম্ভাষণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবন-বেশ পরিধান করিতে হইবে।"

পশুপতি কহিলেন, "সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু যবন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব না।"

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোশাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কিজন্য ম্লেচ্ছের বেশ পরিব?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক না পারিলে, আপনাকে বলপূর্ব্বক পরাইব। অস্বীকারে, লাভের ভাগ—অপমান।

পশুপতি নীরব। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন; কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

প। কোথায় যাইব?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে-সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনজনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসেনা নগরমন্থন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন,—ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিতেছেন। বখতিয়ার খিলজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্ত্তাবহ হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এখান হইতে বিদায় হই।"

পশুপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আপনি এই রাত্রিমধ্যে এ-নগর ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম—ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকায় লইয়া যাইবেন।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় লইলেন। পশুপতি কিয়ৎকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধাতু মূর্ত্তির বিসর্জ্জন

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় লইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে-ধীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতি-পদে মৃত নাগরিকদের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; পদে-পদে শোণিতসিক্ত কর্দ্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহু গৃহ ভস্মীভূত, কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপরি মৃতদেহ। এখনও কোন হতভাগ্য মরণযন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ-সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে-মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক, অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক —[illegible] করিলেন, ফিরিয়া যাইবেন। মনে-মনে তখন ইষ্টদেবীকে

স্মরণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। সহসা আর-এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ-বাটী? তাহা কি যবনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুমময়ী প্রাণপুত্তলীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি দশা হইয়াছে? মনোরমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনা-প্রবাহে কুসুম-কলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন; আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে!

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা তাঁহার পৌরজনসহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহ্যমান অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া, মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকল-শরীরে একস্থানে অবস্থিতি করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনল-তরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ-শরীরে কক্ষে-কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে-ক্ষণে গৃহের নূতন-নূতন খণ্ড সকল অগ্নি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত-প্রকোষ্ঠ আকাশ-পথে বিষম শিখা উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে-ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ-সকল অশনিসম্পাত-শব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানলসংবেষ্টিত আরণ্যগজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্তত দাসদাসী, স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,

কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির, অগ্নি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদগ্ধা স্বর্ণ-প্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন,—"মা! জগদম্বে। আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন মা! একদিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম! তবে কিজন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই-বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?"

মন্দিরদহনে অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ দেখ, ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র; দেবী নহ—ঐ দেখ, অগ্নি জ্বলিতেছে! যে-পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ-কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম, আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল, ইষ্টদেবি। তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।"

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন-আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। এই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখন পর্ব্বতবিদারণানুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল; তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমকালে

পশুপতি তাঁহার নিত্য-সেবার জন্য দুর্গাদাস নামে এক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নগর-বিপ্লবের পরদিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্ত্তি—ভগ্ন হইতে উদ্ধার করিয়া আপন গৃহে স্থাপন

করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা নগর লুট করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলজি অনর্থক নগরবাসীদের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সাহস করিয়া বাঙালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্লে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন, অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টকসকল অর্দ্ধদ্রবীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জল বহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক-সকল শীতল করিলেন এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে, তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃতা হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে—এ কি? সভয়ে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন যে, মনুষ্যের মৃতদেহ রহিয়াছে। তখন উভয়ে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে—পশুপতির দেহ।

বিস্ময়সূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, "যে-প্রকারেই প্রভুর এ-দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবং প্রতিপালকের কার্য্য আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গাতীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সংকার করি চল।"

এই বলিয়া দুইজনে প্রভুর দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সংকারের উপযোগী সামগ্রী অনুসন্ধানে গমন করিলেন এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি-কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহের পূর্ব্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি-কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন এবং তদুপরি পশুপতির মৃতদেহ স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িত-কুন্তলা, ভস্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

দুর্গাদাস সভয়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে ?"

রমণী কহিলেন, "তোমরা কাহার সৎকার করিতেছ ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্ম্মাধিকার—পশুপতির।"

রমণী কহিলেন, "পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যবন কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অদ্য অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভুজার প্রতিমা উদ্ধার-মানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।"

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?"

দুর্গাদাস কহিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ; ধর্ম্মাধিকারের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে ?"

রমণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পত্নী।"

দুর্গাদাস কহিলেন, "তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা, আপনি কি প্রকারে তাঁহার স্ত্রী ?"

যুবতী কহিলেন, "আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা। অনুমরণ-ভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পুরাইবার জন্য আসিয়াছি।"

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, "এখন স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য কাজ করিব। আপনারা উদ্যোগ করুন।"

দুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল ?"

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। দুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, "মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?"

তরুণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন ?—ইহার উদ্যোগ করুন।"

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন জন্য নগরে পুনর্ব্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা দুর্গাদাসকে কহিলেন, "আপনি নগরে যাইতেছেন, নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটিকায় হেমচন্দ্র নামে এক বিদেশী রাজপুত্র বাস

করেন। তাঁহাকে বলিবেন, মনোরমা গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে —তিনি আসিয়া একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকট ইহলোকে মনোরমার এইমাত্র ভিক্ষা।"

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে, মনোরমা পশুপতির পত্নীপরিচয়ে তাঁহার অনুমৃতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসের সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতিমলিনা উন্মাদিনীমূর্ত্তি, তাঁহার চক্ষু গম্ভীর—এখনও অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি দেখিয়া, তাঁহার চক্ষুর জল আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মনোরমা! ভগিনী! এ কী এ?"

তখন মনোরমা জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থিরমূর্ত্তিতে মৃদু-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, যেজন্য আমার জীবন, তাহা আজ চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে অন্যের শ্রবণাতীত-স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট পূর্ব্ব কথার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে-ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দ্দন শর্মাকে কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দ্দনকে অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের পর তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের অনুসন্ধান করিও। আমি যে-স্থানে বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁজিলেই তাহা পাইবে। আমি ভিন্ন সে-স্থান আর কেহই জানে না।" এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন। জনার্দ্দন ও তাঁহার পত্নীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহসূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন, এবং সহাস্য-আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুসুম-কলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরিশিষ্ট

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া, তাহার কিয়দংশ জনার্দ্দনকে দিয়া তাহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখতিয়ার খিলজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর এবং তথায় যবন-দমনোপযোগী সেনা সৃজন কর। তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাত সিদ্ধ করিও।"

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন। মৃণালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজ্য স্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল, কেননা, যবনদিগের ধর্ম্মদ্বেষিতায় পীড়িত এবং তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকে তাহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইলেন। এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র-রাজ্যটি সৌষ্ঠবান্বিত হইয়া উঠিল। ক্রমে-ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। অচিরাৎ রমণীয় রাজপুরী নির্ম্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া, মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানদের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখতিয়ার খিলজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীভূত হইলেন এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সমাপ্ত

বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্‌
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিট্‌লার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯